নগরনামা ও কিছুকথার যৌথ প্রয়াসে পথচলা শুরু হল কাশফুলের

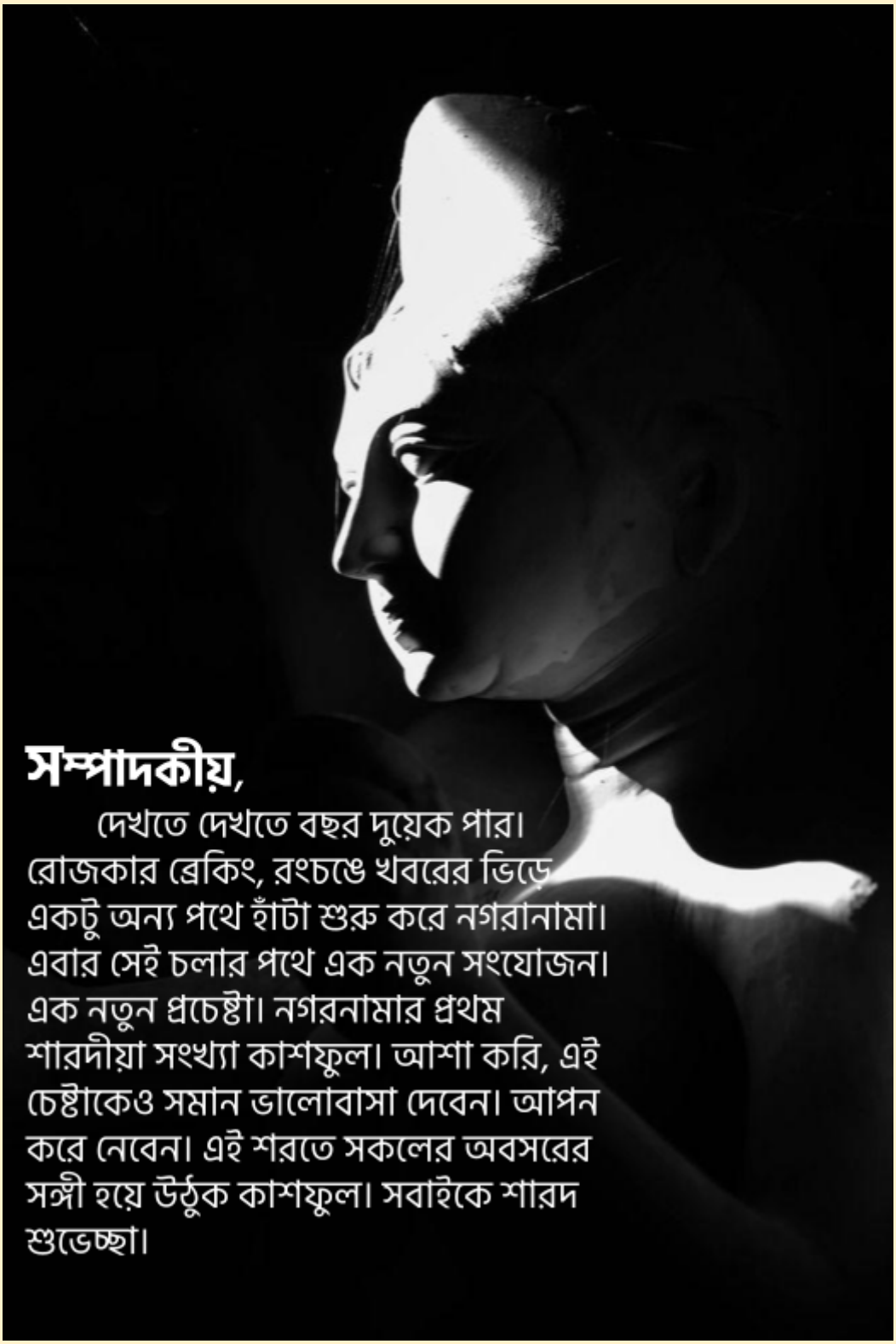

সম্পাদকীয়,

দেখতে দেখতে বছর দুয়েক পার। রোজকার ব্রেকিং, রংচঙে খবরের ভিড়ে একটু অন্য পথে হাঁটা শুরু করে নগরানামা। এবার সেই চলার পথে এক নতুন সংযোজন। এক নতুন প্রচেষ্টা। নগরনামার প্রথম শারদীয়া সংখ্যা কাশফুল। আশা করি, এই চেষ্টাকেও সমান ভালোবাসা দেবেন। আপন করে নেবেন। এই শরতে সকলের অবসরের সঙ্গী হয়ে উঠুক কাশফুল। সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা।

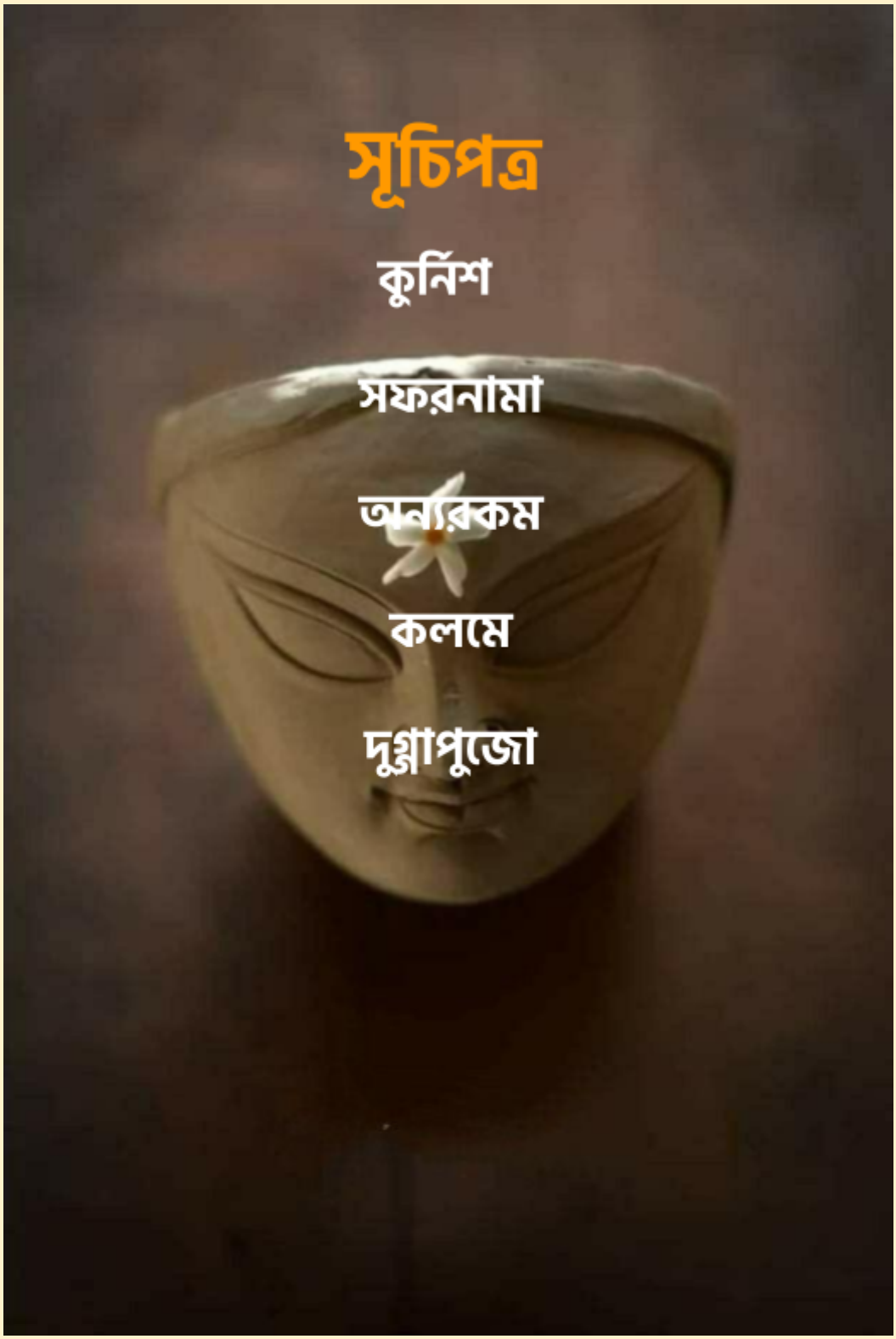

সূচিপত্র

কুর্নিশ

সফরনামা

অন্যরকম

কলমে

দুগ্গাপুজো

জীবনপথে বারবার হোঁচট খাওয়া মহিলাই দেশের ব্যালিস্টিক মিসাইলের কারিগর

শশীকলা সিনহা। অনেকেই তাঁকে BMD (ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স) বলে জানে। হ্যাঁ, একটু অবাক লাগলেও সত্যি। দেশের ব্যালিস্টিক মিসাইলের নেপথ্যে রয়েছেন এই মহিলা। তবে এই সাফল্যের নেপথ্যে এক লম্বা লড়াইয়ের কাহিনী রয়েছে। রয়েছে একাকীত্ব। রয়েছেন হার না মানা দুই সন্তানের মা।

তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে জন্ম শশীকলার। ভারতীয় সেনার মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে ছিলেন বাবা। চাকরি সূত্রে বাবাকে দেশের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। পরিবারের সঙ্গে ছোট্ট শশীকলাও দেশের নানা শহর ঘুরে বেড়িয়েছে। সেই সূত্রে

স্কুলজীবন কেটেছে হায়দ্রাবাদে। অঙ্ক প্রিয় বিষয় ছিল শশীকলার। শশী যে একটু অন্যরকম, তা ছোটো থেকেই বোঝা গিয়েছিল। ক্লাসের অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে কোথাও যেন অনেকটা এগিয়ে শশী। প্রথমে সেন্ট ফ্রান্সিস কলেজ, পরে ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কেরিয়ার শুরু।

এরপর DRDO-তে চাকরি শুরু করেন শশীকলা। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যেই সেই চাকরি ছেড়ে দেন। মাস্টার ডিগ্রি করার জন্য IIT খড়গপুরে পড়তে চলে যান। এরপর সোসাইটি অফ মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কাজ শুরু করেন। ইতিমধ্যেই বিয়ে হয়ে যায় শশীকলার। স্বামী নৌ সেনার আধিকারিক। তখন তিনি সন্তানসম্ভবা। জীবনের প্রথম সন্তান আসছে ঘরে। তাই চাকরি ছেড়ে দেন মা শশীকলা। ১৯৮৯ সালে মেয়ে পবিত্রা জন্ম নেয়। কয়েক বছর পেরিয়েছে। এবার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম নেওয়ার সময়। এমন সময় এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় স্বামীর। দুই মেয়েকে নিয়ে শশীকলা তখন একদম একা। মেয়েদের বড় করে তুলতে হবে। সংসারের দেখভাল করতে হবে। নানা প্রতিবন্ধকতা। তবে লড়াই থামেনি শশীকলার।

১৯৯৭ সাল। DRDO হায়দ্রাবাদের রিসার্চ সেন্টার ইমারতে (RCI) কনট্রাক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ফের কাজ শুরু করেন। ২০০১ সালে ফুল টাইম সায়েন্টিস্ট পদে প্রমোশন হয়। ফ্লাইট ভেইকেলস, RF সিকারস, র‍্যাডমস, র‍্যাডার টেকনোলজি, মিসাইল সিস্টেম, গাইডেড উইপন সহ নানা বিষয় নিয়ে শুরু হয় গবেষণা। তখন ব্যালিস্টিক মিসাইলের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল ভারত। আর DRDO-এর ল্যাবে একজন জেদি

মহিলা ব্যালিস্টিক মিসাইল নিয়ে গবেষণা করতে ব্যস্ত। গবেষণার মাঝে ছবি আঁকায় নিজের মতো করে অবসর খুঁজে নিতেন। বছর দশেক ধরে নিরলস পরিশ্রম। ২০১২ সালে মিসাইল ডিফেন্স প্রজেক্টের ডিরেক্টর হন তিনি। সালটা ২০১৬। পাঁচটি S-400 অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্ট মিসাইল সিস্টেম সরবরাহের জন্য BRICS-এ রাশিয়ার সঙ্গে IGA চুক্তি সাক্ষরিত হয়। পরের বছর ২০১৭ সালে দেশের নানা জায়গায় মিসাইল টেস্ট শুরু হয়। বাকিটা ইতিহাস। আর এই ঐতিহাসিক সাফল্যের নেপথ্যের কারিগর শশীকলা সিনহা।

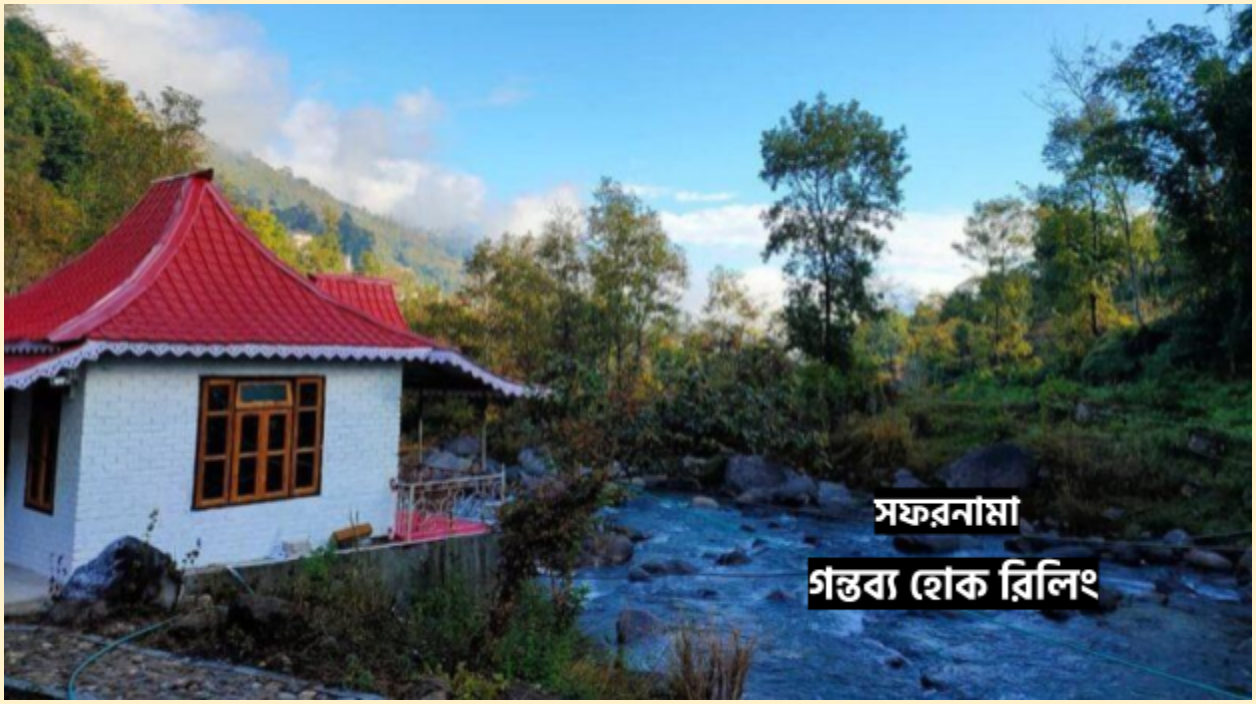

পাহাড়ী নদীর সঙ্গে জমে উঠুক গল্প, গন্তব্য হোক রিলিং

আকাশে মেঘের লুকোচুরি। ভাদ্রের অবিরত বৃষ্টি, অস্বস্তিকর গরম এখনও পিছু ছাড়েনি। তবে ইতিমধ্যেই বাতাসে শিউলির গন্ধ। ঢাকে কাঠি পড়েছে। পুজো আসছে। তার মাঝেই অফিস, রোজকার ব্যস্ততা । উইকেন্ডের শপিং, লম্বা প্ল্যানিং। আরও কত কী। পুজোটা নয় কেটে যাবে। কিন্তু তারপর আবার কাজে ফেরা। একটা অদ্ভুত মনকেমন। আর অনেকটা অজানা খারাপ লাগা। তবে তা দূর করার উপায়ও আছে। পুজোর আগে আগে বা পুজো পেরিয়ে ক'টা দিন কোথাও ঘুরে আসতে পারেন। পাহাড়ী নদী হাতছানি দিয়ে ডাকছে আপনাকে।

গন্তব্য রিলিং। দার্জিলিং জেলার পূর্বে টাইগার হিল থেকে ৩৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছোট্ট এই গ্রাম। এর উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট। মূলত নেপালী ভাষার মানুষজনের বসবাস। গাঁয়ের বুক দিয়েই বয়ে চলেছে রঙ্গিত নদী। রঙ্গিতের কলকল শব্দে আর পাখিদের ডাকে সকাল শুরু হোক। নদীর নিস্তব্ধতায় নামুক রাত। রঙ্গিতের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারলে গাড়ি নিয়ে গ্রামের নানা এলাকা ঘুরে দেখা যেতে পারে। আশপাশে মেরিবং, চংটং সহ একাধিক ছোটো-বড় চায়ের বাগানের পাশাপাশি আপেল ও কমলালেবুর বাগানও রয়েছে। এই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের নেশা থেকে বেরোনো সত্যিই অসম্ভব।

এছাড়াও আশপাশে একাধিক জায়গা রয়েছে। সিঙ্গলীলায় ট্রেকিং করা যেতে পারে। কাছাকাছি দার্জিলিং, ঘুম, কার্শিয়াংও ঘুরে আসা যায়। কাছেই রয়েছে বাতাসিয়া লুপ, জাপানিজ টেম্পল, জু। একদিনের মধ্যেই এই জায়গাগুলি দেখে নিতে পারেন। এককথায়, শহরের কোলাহল থেকে দূরে কোথাও হারাতে ছোট্ট গ্রাম রিলিংয়ের উদ্দেশে পাড়ি দিন।

যাত্রাপথ

আপনি যদি কলকাতা থেকে রওনা দিতে চান, তাহলে শিয়ালদা থেকে পাড়ি দিন এন.জে.পি স্টেশনের উদ্দেশে। এন.জে.পি-শিলিগুড়ি থেকে আপনার গন্তব্যে পৌঁছাতে গাড়ি ভাড়া করতে হবে। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য খরচ ৪০০০-৪,৫০০ টাকা।

ঠাঁই

মাথাগোঁজার জন্য একাধিক হোমস্টে রয়েছে। রয়েছে খাওয়া-দাওয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। এখানকার রিভার রিসর্টের আথিথেয়তা মন্দ নয়। নদীর আশপাশের রুমের জন্য খরচ হতে পারে ১৮০০ – ২০০০ টাকা। নন-রিভার সাইটের জন্য খরচ হতে পারে ১৫০০-১৬০০ টাকা। লনে সময় কাটানোর পাশাপাশি বনফায়ারও উপভোগ করতে পারেন। কয়েকটা দিন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ুন। পাহাড়ী নদীর সঙ্গে জমে উঠুক গল্প।

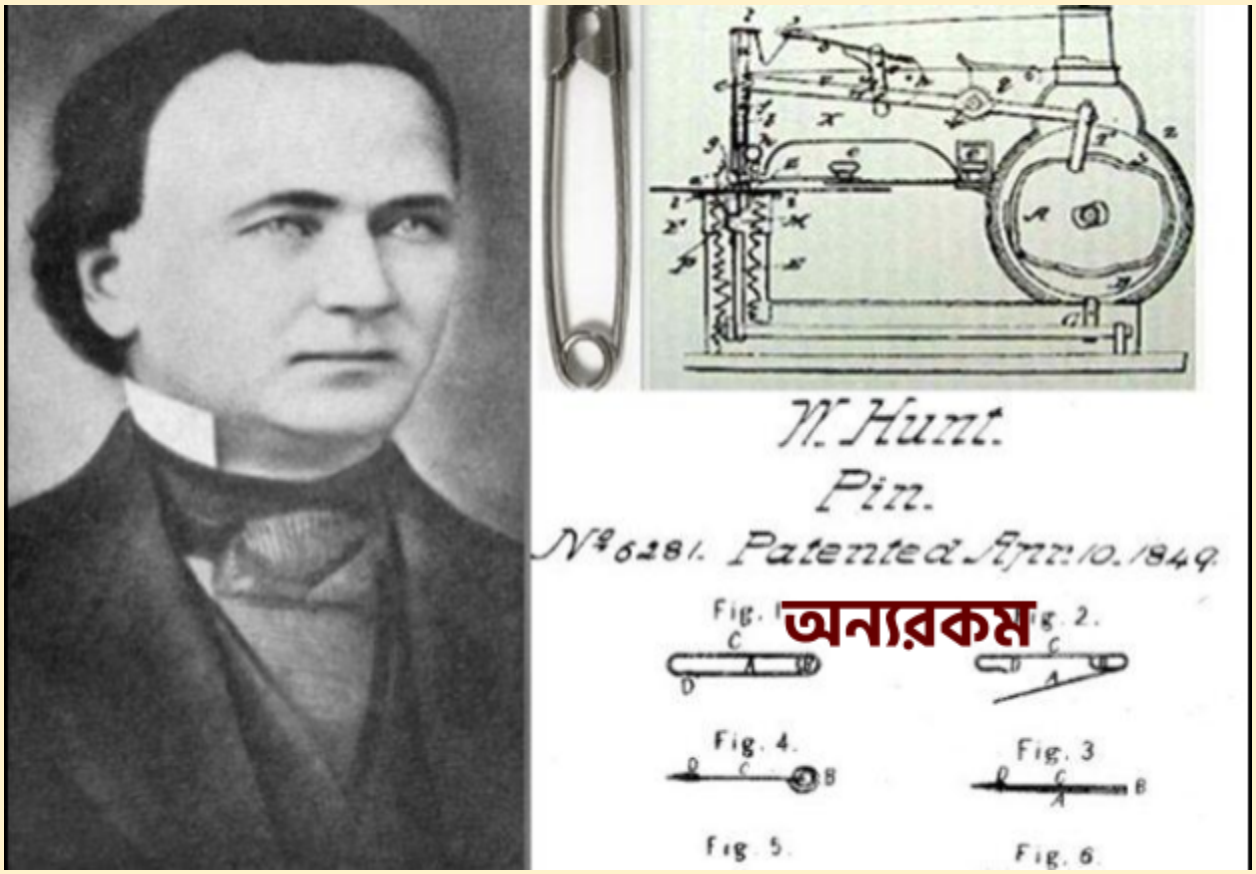

বন্ধুর ধার শোধ করতে গিয়েই সেফটিপিনের জন্ম, বাকিটা ইতিহাস

সেফটিপিন। এই ছোট্ট বস্তুটি কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রোজকার জীবনে একাধিক জিনিসপত্রের ভিড়ে বেশ দৃঢ়ভাবেই নিজের জায়গা করে নিয়েছে। তা সে ওড়না আটকানো, শাড়ি পরা হোক বা অন্য কোনও কাজ। বিশেষ করে মহিলাদের কাছে সেফটিপিনের এক আলাদা চাহিদা রয়েছে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র জিনিসটির পিছনেও রয়েছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। রয়েছে নানা অজানা গল্প।

ইতিহাস হাতড়ালে সেফটিপিনের জন্মলগ্নের একটা ধারণা পাওয়া যায়। সালটা ১৮৪৯। আজ থেকে প্রায় ১৭১ বছর আগে জন্ম নিয়েছিল সেফটিপিন। তবে কোনও দীর্ঘ গবেষণা বা অবসরের এক্সপেরিমেন্ট থেকে জন্মায়নি এই বস্তু। বলা ভালো, অনেকটা প্রয়োজনের তাগিদেই তৈরি হয় বর্তমানের বহুল ব্যবহৃত এই সামগ্রী। আর এই উদ্ভাবনের নেপথ্যে রয়েছেন তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত যন্ত্রকৌশলী ওয়াল্টার হান্ট(Walter Hunt)।

বরাবরই জিনিসপত্র নিয়ে ভাঙা-গড়ার নেশা ছিল মার্কিন মুলুকের এই বাসিন্দার। নানা ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করতেন। কোনওটা দারুণ সফল হয়েছে। কোনওটা আবার বহু চেষ্টার পরও যথাযথ অবয়ব পায়নি। তবে এবার বিপাকে পড়েছিলেন তিনি। এক বন্ধুর কাছ থেকে ১৫ ডলার ধার করেছিলেন। ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু পকেট গড়ের মাঠ। কিছুতেই বন্ধুর সেই টাকা শোধ করা যাচ্ছিল না।
বন্ধুর ঋণ শোধ করার তাগিদে ফের যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে পড়েন। যদি কিছু একটা তৈরি করা যায়, তাহলে হয়তো ঋণমুক্ত হওয়া যাবে। এদিক-ওদিক ভাবতে ভাবতে একটা লম্বা তারের টুকরো বাঁকিয়ে কিছু একটা তৈরির করার চেষ্টা করেছিলেন। আর সেটাই পরে সেফটিপিনের আকার নেয়। পিন যাতে গায়ে ফুটে না যায় সেই জন্য মাথার দিকটা চ্যাপটা করে একটা খাপের মতো তৈরি করা হয়। সেই শুরু। ১৮৪৯ সালের এপ্রিলে সেফটিপিনের পেটেন্ট করিয়ে নিলেন ওয়াল্টার। বিক্রি শুরু হল। পেটেন্ট বেচে যা পেলেন তাতে বন্ধুর ধার তো শোধ হল, পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ ডলারের মালিক হয়ে উঠলেন ওয়াল্টার।

পাতা ঝরার মরশুমে

পড়ন্ত রোদে অপেক্ষার আঁকিবুকি,
বয়স বাড়ে কার্নিশে লেগে থাকা গল্পগুলোর
এবার বোধহয় বিচ্ছেদই শ্রেয় ;
হাতে হাত রাখার অনেক ঝুঁকি।

একটা সব তছনছ করে দেওয়া ঝড়ের আগে,
ঝরে পড়ার ভয়ে জমাট বাঁধছে মেঘগুলো
এবার বোধহয় না চেয়েও হতে হবে শেষ;
শহরে আচমকা অন্ধকার,কারও অবাধ অনুপ্রবেশ।

এভাবেই অবহেলায় বেঁচে থাক অপেক্ষা,
যে চিঠির উত্তর জানা, তা বন্দি থাকুক খামে
এবার অপরিচিতের মতোই দেখা হোক;
কোনও পাতা ঝরার মরশুমে।

দেখা হোক

রোজকার এই জবাবদিহি পেরিয়ে
একটা অজানা শর্তহীন মুহূর্তে দেখা হোক
যেন এর আগে কখনও আলাপ হয়নি
এই কুঁচকে যাওয়া আঙুল, চোখের নিচে জমা কালি
যেন প্রথমবার দেখলাম
এগুলো একঘেয়ে নয়, এদের গায়ে কোনও বোঝাপড়া লেগে নেই,
বরং একটা অদৃশ্য আকর্ষণ মিশে রয়েছে।

রোজ রাতে হাতড়ে যাওয়া শরীর পেরিয়ে
ভিতরে লুকিয়ে থাকা তোমার সাথে দেখা হোক
যেখানে পাশ ফিরিয়ে ঘুমোনোর একাকীত্ব নেই
অনিচ্ছায় মুখ বুজে মানিয়ে নেওয়া নেই
আছে দুটো স্বেচ্ছাধীন মনের বেয়াদবি

স্মৃতির খোলামকুচি আগলে আর এভাবে বাঁচা নয়
সম্পর্কের বয়স, মাস, বছরের হিসেব নিকেশ নয়
তোমার সঙ্গে একটা মুহূর্তে দেখা হোক
যে মুহূর্তে কোনো দায়বদ্ধতা নেই
নেই না পাওয়ার অভিযোগ

বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে যাওয়া শহরের রাজপথে
আচমকা তোমার সঙ্গে দেখা হোক
একটা ঠান্ডা বাতাস শরীরজুড়ে জারি করুক নতুন পরোয়ানা
এভাবেই শতাব্দী জুড়ে আমাদের দেখা হোক
এভাবেই চলুক আমাদের আনাগোনা

—----------

পঞ্চাশের নোট

আজ সন্দীপের নাইট শিফট। দিনভর ছুটি নেওয়ার চেষ্টা করেও কোনও লাভ হয়নি। শেষমেশ দুপুরের খিঁচুড়ি,আলুর দম খেয়ে সাড়ে দশটা নাগাদ অফিস বাস ধরে। যথাসময়ে বাস ছাড়ল। আজ অন্যদিনের মতো তেমন ভিড় নেই। এমনিতেই যা ওয়েদার। তারউপর রাতের শিফ্ট। কয়েকজন বোধহয় ডুব মেরেছে। যাইহোক, উঠেই সোজা জানালার সিটের দিকে এগিয়ে গেল সন্দীপ। জানালা হাল্কা খোলা রেখে বসেছিল। ফাঁকা রাস্তায় অন্ধকার পাহাড়ি পথের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে বাস। গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়েছে। কয়েক মিনিটেই পুরো বিষয়টা উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। হাল্কা ঝিমুনিও উপস্থিত। এমন সময় হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে পাড়ার বিপিন পাশে বসে। যদিও আলো আঁধারিতে পুরোটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। তবে বিপিনকে চিনতে ভুল করেনি সে । ওর গায়ে একটা ছেঁড়া সেন্ড গেঁজি ছিল।

-একি তুই... । তুই তো...

সন্দীপ কথাটা শেষ করার আগেই ভাঙা গলায় বিপিনের জিজ্ঞাসা

- কেমন আছিস দোস্ত। আমার মা আর তুলি কেমন আছে রে ?

গলা শুকিয়ে গেছিল সন্দীপের। এই বৃষ্টিতেও দরদর করে ঘামছিল।

- তুলি ভালো আছে। কিন্তু তুই এখানে ! সন্দীপ আর কিছু বলার আগেই

- আরে ছাড় ওসব কথা। এই নে তোর পঞ্চাশ টাকা। মাপ করে দিস ভাই দিতে একটু দেরি হয়ে গেল। আসলে সেদিন ফিরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু...। কথাটা শেষ না হতেই

বাসের চড়া হর্ন কানে এল। কেউ যেন সন্দীপের কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছিল । দেখে অফিসের জুনিয়র তাপস পাশে বসে । আরে কত ঘুমোবে সন্দীপ দা। আর তখন থেকে কী বিড়বিড় করছ। পৌঁছে গেছি তো। চল চল, নামতে হবে।

কিছুই মেলাতে পারছিল না সন্দীপ। অফিস পৌঁছে ডেস্কে ব্যাগটা রেখে সোজা বাথরুমে চলে যায়। মোবাইলের দিকে তাকিয়ে দেখে আজ ২১ শে আষাঢ়। ঠিক একবছর আগে আজকের দিনে তার বন্ধু বিপিন খুন হয়েছিল। সেদিন এইরকমই এক সন্ধ্যা ছিল। সকাল থেকে খুব বৃষ্টি। দু'জনে সিধুদার দোকনে বসে চা খাচ্ছিল। কলেজের পর বিপিনের কোনও চাকরি জোটেনি। পার্টি পলিটিক্স করেই কাটত। পাড়ায় বেশ নামডাকও ছিল। বাবা মরার পর মা-বোনের সংসারে একমাত্র ভরসা ছিল সে। কেউ বা কারা বলেছিল ক্ষমতায় এলে খুব তাড়াতাড়ি একটা চাকরি দেবে। সারাদিন পার্টির জন্য খাটত। সেই সন্ধ্যায় সন্দীপের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার নেয় বিপিন। বোনের জন্য স্কেচবুক কিনতে হবে। সন্দীপকে বাড়ি পাঠিয়ে বলেছিল সামনের মাঠ থেকে আসছে। কিন্তু আর ফেরেনি। সকালে পাশের জঙ্গলে ওর ধড়, মুণ্ডু আলাদা হয়ে পড়েছিল। লোকজন বলাবলি করছিল বিরোধী দলের কাজ।

তাহলে আজ কী হল ? তাহলে কি স্বপ্ন দেখছিল বাসে ? যাইহোক মুখ হাত ধুয়ে হাল্কা ভেজা জামাটা খুলে একবার ঠিক করে পরতে যাবে, এমন সময় বাথরুমের মেঝেতে কী যেন একটা পড়ল। হাতে তুলে দেখে কাদা মাখা, কালচে লাল রঙের একটা পঞ্চাশ টাকার নোট...

—----------

সিংহের দেশে সিংহবাহিনী

প্রবাসে পুজো। এ নতুন কিছু নয়। বাতাসে পুজোর গন্ধ পেলেই শুরু হয়ে যায় মায়ের বিদেশ ভ্রমণ। বিমানে চড়ে ইউরোপ,আমেরিকা থেকে শুরু করে ব্রাজিলের সুদুর প্রান্তে পাড়ি দেন দশভূজা। তবে এবার বাহনের দেশে পা রাখছেন মা। না এতদিন ওখানে এসব কিছুই হয়নি। প্রথমবার সিংহের দেশে হাজির সিংহবাহিনী।

হ্যাঁ সত্যি। এবার মাসাইমারায় হবে দেবীর আরাধনা। মাসাইমারা। নাম শুনলেই ঘন জঙ্গল, অ্যাডভেঞ্চার, সিংহ, মাসাই উপজাতি এগুলি মাথায় আসে। এবার আফ্রিকার এই প্রান্তেও পুজোয় মতে উঠবে মানুষজন। সৌজন্যে বাঙালি পর্যটকরা।

ইতিমধ্যেই মিন্টু পালের বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছে প্রতিমা। শিল্পীর কথায়, এর আগে নানা জায়গায় গেছে প্রতিমা। তবে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

এই পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা হলেন বাঙালি কন্যা রাখি মিত্র সরকার। তিনি বলেন, প্রথমবার মাসাইদের দেশে মায়ের পুজো হবে। ইচ্ছে ও উদ্যোগ অনেকদিনের। শেষমেশ তার বাস্তবায়ন হল। তবে প্রথমবারে বাজেট বুঝে ও ছোটো মূর্তিতেই পুজো হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও বড় কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে। আসলে এই রাখি মিত্র সরকারের নিজস্ব একটি ট্যুরিজম কোম্পানি রয়েছে ওখানে। বেশিরভাগ সময় ওখানেই থাকতে হয়। তা বলে পুজোর আনন্দ থেকে দূরে থাকা যায় না। সেখানকার বাঙালি পর্যটক এবং স্থানীয় মাসাই উপজাতির বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে দেবী দুর্গার আরাধনা করবেন। শোনা যাচ্ছে, পুজোর জন্য কলকাতা থেকে তিন জন মহিলাও পাড়ি দিয়েছেন। মূলত পুজোর কাজকর্মে যুক্ত থাকবেন তাঁরা।

—----------

কোলাজে পুজো

তর্পণ-বোধন

দৃষ্টি

সূর্য ডোবার আগে